তারিখ 11 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

যুগান্তর

সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় বেহাল দশা

সর্বত্র অনিয়ম দুর্নীতি : ম্লান হচ্ছে সাফল্য

মুশতাক আহমদ

প্রাথমিক শিক্ষায় সার্বিকভাবে বেহাল দশা বিরাজ করছে। প্রায় সারাদেশেই বিদ্যালয়ে ঠিকমতো পাঠদান না হওয়া, নিম্নমানের পাঠদান, স্কুলে স্কুলে কোচিং এবং শিক্ষকদের মাঝে প্রাইভেট টিউশনির বিস্তার, বিদ্যালয়ের নিম্নমানসম্পন্ন অবকাঠামো, পরিবেশহীনতা, ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র কিন্ডারগার্টেন, বই পাঠ্যভুক্ত করা নিয়ে ঘুষবাণিজ্য, শিক্ষা প্রশাসনে দুর্নীতি, বিদ্যালয় পরিদর্শনে গাফিলতি, শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মাঝে হতাশাসহ নানা কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বর্তমান সরকারের আমলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তির হার বৃদ্ধি বা শতভাগে উন্নীত করা ও সমাপনী পরীক্ষায় যে সাফল্য রয়েছে, তা ওইসব অনিয়ম-দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে ম্লান হয়ে গেছে।

বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ৮১ হাজার রয়েছে। এর মধ্যে ৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারি বিদ্যালয়। বাকিটা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হয়ে থাকে। এর মধ্যে রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসায় ইবতেদায়ি পাঠদানসহ বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিন্ডারগার্টেন আর ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলো চলছে একেবারেই লাগামহীনভাবে। এক হিসাবে দেখা গেছে, সারাদেশে প্রায় ২৪ হাজার কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। এর মধ্যে রাজধানীতেই রয়েছে ১৭শ'। এসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে প্রায় ৫০ লাখ শিক্ষার্থী। যাদের জন্য ১ লাখ ২০ হাজারের মতো শিক্ষক রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় সমিতি দ্বারা। তারা নিজেদের মতো বৃত্তি পরীক্ষারও আয়োজন করে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে প্রাথমিক ... শ্রেণী ...

শিক্ষায় · পৃষ্ঠা ১৫ · কলাম ২

শিক্ষায় : বেহাল দশা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৯০ লাখ ২৬ হাজার শিক্ষার্থী। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া করে প্রায় ১ কোটি ১৫ লাখ শিক্ষার্থী। এর বাইরে মাদ্রাসায় ইবতেদায়ি স্তরে লেখাপড়া করে ১০ লক্ষাধিক। বাকিটা বেসরকারি বিদ্যালয়ে। আবার বর্তমানে কেবল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছেন প্রায় ২ লাখ ১১ হাজার। বেসরকারি বিদ্যালয়ে রয়েছেন প্রায় ১ লাখ। সেই হিসাবে কেবল সরকারি বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত দাঁড়ায় ১:৫৪।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ জানান, বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৪৫। তিনি জানান, হজ, তীর্থযাত্রা, মাতৃত্বজনিত ছুটি, প্রশিক্ষণসহ সারা বছরই বিভিন্নভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদ শূন্য থাকে। সেই শূন্যতা পূরণে সরকার ২০ হাজার খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। এর বাইরে আরও ১২ হাজার শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়াও চলছে। এরা যুক্ত হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত আরও হ্রাস পাবে।

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে এমন একটি সংগঠন গণসাক্ষরতা অভিযান (ক্যাম্পে)। এর নির্বাহী পরিচালক এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, শিক্ষা তথা প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে ইতিবাচক ও ভালো দিক হল শিক্ষার একটি চাহিদা তৈরি হয়েছে সর্বক্ষেত্রে; যা ভারতও পারেনি। এই ভালোর দিকটি কাজে লাগাতে পারলে জাতিগতভাবে বাংলাদেশের অনেকদূর এগোনো সম্ভব। কিন্তু সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল শিক্ষার মান, ড্রপআউট আর বিনিয়োগ। নানা কারণে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। অবশ্য শতভাগ ভর্তির কথা বলা হলেও ড্রপআউট আছে। এখানে এসেই হোঁচট খেতে হচ্ছে। আবার সব শিশুর ভর্তির খাতায় নাম লেখানোর কথা বলা হলেও প্রায় ১০ ভাগ প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। মাঝামাঝি প্রতিবন্ধীদের পর্যন্ত ভর্তি অন্তর্ভুক্ত করা হলেও বাকিদের বিষয়টি কি হবে? তিনি বলেন, শিক্ষায় বিনিয়োগ বৈষম্য সৃষ্টি করছে। ক্যাডেট কলেজগুলো সরকারি অর্থেই চলে। অথচ সেখানকার শিক্ষক, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, ক্লাসরুম ইত্যাদি সুবিধা সব শিশুকে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। প্রতি পাবলিক পরীক্ষার পর গ্রাম-শহরের শিক্ষার মানের বৈষম্যের দিকটিও পরিষ্কার বোঝা যায়। এর বাইরে চরাঞ্চল, হাওরসহ দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীরাও বৈষম্যের শিকার হয়। তিনি বলেন, চলতি বছর শিক্ষায় বাজেটে বরাদ্দ কমেছে। বাংলাদেশে শিক্ষায় মাথাপিছু ৫০ ডলার ব্যয় হয়, যেখানে উন্নত বিশ্বে এই ব্যয় ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার ডলার। সুতরাং বর্তমানের বড় চ্যালেঞ্জ শিক্ষায় মান অর্জনের বিষয়টি উৎরাতে হলে অবশ্যই বিনিয়োগ করতে হবে। শিক্ষায় ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় নয়, বিনিয়োগ— এটা সরকার ও ব্যক্তি সবাইকেই বুঝতে হবে।

একাডেমিক দিক : সরকারের সর্বশেষ শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা একই পাঠ্যবই পড়বে। সে হিসেবে সাধারণ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয় বা কিন্ডারগার্টেনে সরকার সরবরাহকৃত একই ধরনের পাঠ্যবই পড়ানোর কথা। ২০১৩ সালে ওই একই পাঠ্যবই সরবরাহের লক্ষ্যে বর্তমানে কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় এক বছর আগে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বইয়ের বোঝা কমানোর নির্দেশনা দেন। কিন্তু সেই নির্দেশনা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। জানা গেছে, রাজধানী থেকে শুরু করে দেশের ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত একশ্রেণীর অর্ধশিক্ষিত ও টাউট-বাটপার শ্রেণীর লোক কিন্ডারগার্টেন খুলে বসেছে। অনেকে সেগুলো অবশ্য প্রি-ক্যাডেট স্কুল নামেও চালাচ্ছে। সারাদেশে এমন স্কুল কতটি রয়েছে, তা যেমন জানে না সরকার, তেমনি কিভাবে চলছে, কি পড়াচ্ছে, কতটি বই পড়াচ্ছে, কত টাকা নিয়ে যাচ্ছে কোন কিছুই তদারকি হচ্ছে না। ওইসব বিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের পর্যন্ত ৮-১২টি বই পড়ানো হচ্ছে। ঢাকার বাংলাবাজারের একশ্রেণীর প্রকাশক অখাদ্য-কুখাদ্য বই প্রকাশ করছে। সেসব বই টাকার বিনিময়ে কিন্ডারগার্টেনগুলো পাঠ্যভুক্ত করে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ১০-১২ পৃষ্ঠার ওইসব বইয়ের দাম ১-২শ' টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করতে দেখা যায়। এর বাইরে পোশাক, ব্যাজ, ব্যাগ, ডায়েরি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদি নানা অদ্ভুত খাত সৃষ্টি করে অভিভাবকদের কাছ থেকেও অর্থ হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে।

মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেছে, বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে প্রকট হচ্ছে শিক্ষকস্বল্পতা, ঠিকমতো পাঠদান না হওয়া, নিম্নমানের পাঠদান, স্কুলে স্কুলে কোচিং, শিক্ষকদের মাঝে প্রাইভেট-টিউশনির বিস্তার ও পরিবেশহীনতা। নাম প্রকাশ না করে ভোলার একটি উপজেলার একজন শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৫ ভাগেরও বেশি রয়েছেন মহিলা শিক্ষক। ওই শিক্ষকের অনেকেরই মাতৃত্বকালীন ছুটি থাকে। এছাড়া শিক্ষকদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কারণেও ছুটিতে থাকতে হয়। এর ফলে বিদ্যালয়ে সারা বছরই শিক্ষক সংকট লেগে থাকে। এর বাইরে পদশূন্য বা নিয়োগজনিত স্বল্পতা তো রয়েছেই। এ কারণে এমন শত শত বিদ্যালয় রয়েছে যেখানে এক থেকে ৩ জন শিক্ষক ৫টি শ্রেণীর ক্লাস নেন। এর সঙ্গে অবশ্য 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র মতো আবির্ভূত হচ্ছে শিক্ষকদের একাডেমিক যোগ্যতা। কম এবং বেশি— শিক্ষকের এই দুই যোগ্যতাই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অভিশাপ নিয়ে এসেছে। দেশে প্রায় ৩৫ হাজার রেজিস্টার্ড প্রাথমিক, কমিউনিটি, পরীক্ষণ বিদ্যালয়, এনজিও, আনন্দ স্কুল ইত্যাদি রয়েছে। এসব স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। শিক্ষা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ওইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গণিত-ইংরেজি তো দূরের কথা, বাংলাও ঠিকমতো বোঝেন না, লেখেও পড়াতে পারেন না। আবার সরকারি বিদ্যালয়ে ইদানীং উচ্চশিক্ষিত এবং বিদ্যালয় পড়ুয়া গ্রাজুয়েট নিয়োগ পাচ্ছেন। তাদের অনেকেই ঠিকমতো ক্লাস নেন না। এদের অনেকেই ভালো চাকরি লাভের ইচ্ছায় বা লেখাপড়ার কারণে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন।

বিদ্যালয়গুলোতে সাম্প্রতিক সংযোজন হল কোচিংয়ের বিস্তার। পাশাপাশি অনেকে প্রাইভেট এবং টিউশনি ব্যবসাও জমিয়ে ফেলেছেন। অভিযোগ রয়েছে, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার নাম করে স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলক কোচিং চালু হয়েছে। কোচিংয়ের জন্য আবার অভিভাবকদের পকেট কাটা হচ্ছে। এর বাইরে ওই পরীক্ষায় আরও ভালো ফল করানোর নামে বাসাবাড়িতে পর্যন্ত কোচিং, টিউশনি ও প্রাইভেটের বিস্তার লাভ করেছে। সবচেয়ে উদ্বেগের হল, উপবৃত্তির অর্থে ভাগ বসানো। পটুয়াখালীর দাসপাড়া ইউনিয়নের একজন অভিভাবক জানান, তার ছেলে উপবৃত্তির অর্থ পাওয়ার পর স্কুলের শিক্ষকরা প্রাইভেট পড়তে বলেন। শেষে সেই অর্থের সঙ্গে আরও যুক্ত করে প্রাইভেট পড়ানো হয়।

জানা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতোই একই বেহাল দশা বিরাজ করছে মাদ্রাসায় প্রাথমিক স্তর ইবতেদায়িতেও। ওই স্তরে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা এবং দাখিল ও আলিম-ফাজিল মাদ্রাসা সংযুক্ত ইবতেদায়ি স্তর রয়েছে। সংযুক্ত মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষা প্রদান ও মানের অনেকটা নিয়ন্ত্রণ থাকলেও এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র অনেক ইবতেদায়ি মাদ্রাসাই মাননিয়ন্ত্রণ করছে না। এক্ষেত্রে অবশ্য ওইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের চাকরি ও বেতন-ভাতা সংক্রান্ত জটিলতা প্রধান ভূমিকা রাখছে। স্বতন্ত্র মাদ্রাসায় শিক্ষকরা এক হাজার টাকা করে বেতন পান। তারা জানান, সারাদেশে এ ধরনের প্রায় ৬ হাজার মাদ্রাসা রয়েছে। এক সময় ১৮ হাজার মাদ্রাসা ছিল। ওইসব প্রতিষ্ঠানের লাখ লাখ শিক্ষার্থী কিছুই শিখছে না।

প্রশাসনিক দিক : মাঠপর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে দুটি দফতর রয়েছে। একটি হচ্ছে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস আরেকটি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি)। প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে থানা শিক্ষা অফিসার শীর্ষ কর্মকর্তা। কিন্তু শিক্ষকদের কাছে মূর্তমান আতংকের নাম হচ্ছে ওই অফিসের উচ্চমান সহকারী। তিনি ইচ্ছা করলে শিক্ষকদের দিনকে রাত আর রাতকে দিনে পরিণত করতে পারেন। এ কারণে শীর্ষ কর্মকর্তা বা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নন, ওই উচ্চমান সহকারীই শিক্ষকদের কাছে 'বড়বাবু' হিসেবে পরিচিত। বেতন-ভাতা থেকে শুরু করে নানা কাজে তার কাছে শিক্ষকরা রীতিমতো জিম্মি থাকেন। অভিযোগ, অসাধু শিক্ষা কর্মকর্তারা অবশ্য ওই বড়বাবুকেই হাতিয়ার করে অর্থ উপার্জন করে থাকেন। যে কারণে অনেক উপজেলায় বড়বাবুরাই প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা বনে যান।

শিক্ষা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এর বাইরেও অনেক দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। একজন শিক্ষা কর্মকর্তার (টিইও) মাসে ৫টি, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার (এটিইও) ১০টি এবং ইন্সট্রাক্টরের ১০টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করার কথা। কিন্তু ওই পরিদর্শনে রয়েছে ব্যাপক গাফিলতি। অনেকেই ওই পরিদর্শনে যান না। আবার গেলেও একাডেমিক দিকের চেয়ে অনেকে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত দিক নিয়ে পরিদর্শন রিপোর্টে বেশি উল্লেখ করে থাকেন। বিপরীত দিকে অনেক টিইও বা এটিইও'র ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে, স্কুল পরিদর্শনে গেলে শিক্ষকপ্রতি ১শ' টাকা করে নিয়ে থাকেন তারা। কোন স্কুলে ৮ জন থাকলে ৮শ' টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। না দিলে শোকজসহ নানা ধরনের হয়রানিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। মাঠপর্যায়ের আরেক দফতর হল ইউআরসি। ৪ বা ৫ জনের জনবল নিয়ে গড়া ওই প্রতিষ্ঠান দেশের প্রত্যেক উপজেলায় রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ইউআরসি সারা বছরই বন্ধ থাকে। প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা থাকলেও তা দেয়া হয় না। আর কাজ না থাকার সুযোগে উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষায় ওই দু'দফতর পরস্পরের বিরুদ্ধে লেগে থাকে।

বৃহস্পতিবার ঢাকায় উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সমিতির ইফতার পার্টি ছিল। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রী দু'জনই অংশ নেন। নাম প্রকাশ না করে বেশকিছু শিক্ষা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শিক্ষার মানে নেতিবাচক প্রভাবের পেছনে কেবল শিক্ষা প্রশাসনের দুর্নীতি, পরিদর্শনের অভাব বা শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পাঠদানই দায়ী নয়। বিষয়টি সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। সাড়ে ৩ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে। সাধারণত ৬৫ ভাগ পদোন্নতিতে পূরণ হওয়ার কথা। যদিও বর্তমান সরকার সরাসরি প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে। কিন্তু পদোন্নতি না দেয়ায় সারাদেশে বর্তমানে ৬ হাজারের বেশি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। আবার প্রধান শিক্ষকের এটিইও বা টিইও হওয়ার পথ রুদ্ধ। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি-টু) শেষ হয়ে গেছে। অথচ ওই প্রকল্পে প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডারের যে কথা বলা ছিল, তা সরকার বাস্তবায়ন করেনি। টিইও এবং টিইওদের প্রমোশনের ব্যবস্থা নেই। ক্যাডার হলে এ বঞ্চনা দূর হতো। এর ফলে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মাঝে যে হতাশা কাজ করছে, তা দূর হতো।

চাকরি জাতীয়করণ ও শিক্ষক আন্দোলন : সারাদেশে রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়গুলোকে সরকারিকরণের ব্যাপারে সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সে অনুযায়ী কাজ চলছে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, এ ব্যাপারে নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির প্রণীত রিপোর্ট চূড়ান্ত। আগামী সপ্তাহে তা অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠানো হবে। সূত্র জানায়, ওই নীতিমালার আওতায় প্রাথমিকভাবে প্রায় ২৫ হাজার বিদ্যালয়ের ১ লাখ শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সবার একসঙ্গে নয়, তিন ধাপে চাকরি পূর্ণরূপে জাতীয়করণ হবে।

আবার সারাদেশে এ ধরনের প্রায় ৩৫ হাজার বিদ্যালয় রয়েছে। অর্থাৎ আরও অন্তত ১০ হাজার বিদ্যালয় থাকছে সরকারিকরণের বাইরে। ফলে বেসরকারি শিক্ষকদের সবাই যেমন জাতীয়করণের সুফল পাচ্ছেন না, তেমনি আন্দোলনও একবারে শেষ হচ্ছে না।

সরকারের বক্তব্য : প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দেখে থাকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, ইবতেদায়ি শিক্ষকদের বেতন-ভাতার ব্যাপারে বর্তমানে মন্ত্রণালয় একটি উদ্যোগ নিয়েছে। সব সমস্যার মূলে রয়েছে অর্থ। অর্থের সংস্থান করা গেলে তাদের বিষয়টি ইতিবাচকভাবে সমাধান করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, শতভাগ ভর্তি, সমাপনী পরীক্ষা, সমন্বিত শিক্ষা চালু, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারি বিদ্যালয়ের মতোই শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হ্রাসসহ প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই সরকার যুগান্তকারী পরিবর্তন ও উন্নয়ন এনেছে। এটা ঠিক যে, শিক্ষায় মানের চাহিদার শেষ নেই। আর সারাবিশ্বই এখন এই মান অর্জন নিয়ে সংগ্রাম করছে। আমরাও তার বাইরে নই। বিদ্যমান মানে আমরাও সন্তুষ্ট নই। তাই মানোন্নয়ন নিয়ে কাজ চলছে। যদিও তা একদিনে অর্জন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, কিন্ডারগার্টেনগুলো নিয়ন্ত্রণ নয়, মনিটরিং করার ইচ্ছা রয়েছে সরকারের। সে লক্ষ্যে একটি নীতিমালার খসড়া হয়েছে। চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে মন্ত্রণালয়ে। তিনি জানান, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণীত হয়েছে মূলত শিক্ষার মানের অর্জনকে সামনে রেখে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হ্রাস, ক্লাসরুমের আকার ছোট করা বা সর্বোচ্চ ৪০ জনে রাখা, নিচের দিকে রুমের আকার সর্বোচ্চ ৩০ জনে রাখা, ক্লাসরুমে শিক্ষার্থী কতক্ষণ পড়ার মধ্যে থাকে তা বের করাসহ নানা দিক রয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারীদের হতাশার ব্যাপারে তিনি বলেন, সরকার বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। আরও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে মনিটরিংয়ে দুর্বলতা থাকতে পারে। তা চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রধান শিক্ষকদের প্রমোশন বন্ধ থাকার ব্যাপারে তিনি বলেন, এটা তাদেরই মামলার কারণে বন্ধ রয়েছে।